



## Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 230 - 238

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

# দিব্যেন্দু পালিতের নির্বাচিত ছোটগল্পে নারী পরিসর : একটি বিশ্লেষণী পাঠ

ময়ূরী ঘোষ নন্দী

গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: [mayuri.nandy100@gmail.com](mailto:mayuri.nandy100@gmail.com)



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

### Keyword

Women, Socio-Economic, Insider, Middle Class, Sexuality, Existential Crisis, Marital conflict, Physical existence, Mental existence, Psychological Complications.

### Abstract

Dibyendu Palit is an important writer in twentieth-century Bengali literature. He wrote many short stories about the lives of middle-class people in Bengal. His stories are set during the time after worldwar two, when life became very difficult for many families. Money problems, job insecurity, and social changes made daily life hard. During this time, men tried hard to earn money and support their families, while women often had to give up their own dreams and wishes to keep the family together. In Dibyendu Palit's stories, women play a very important role. He shows them as real people with feelings, thoughts, and struggles. Many of the women in his stories belong to middle-class families and face many problems in their daily lives, which makes them so real. Two main problems faced by women can be seen in Palit's stories, the first is the existence of social aspects, and the second is physical and mental existence on her own. Many women in Palit's stories feel lonely and sad inside. Sometimes they are unable to share their feelings with anyone. Their dreams, hopes, and desires remain unfulfilled, which makes them frustrated. Palit's women also struggle to understand their own identity and purpose in life. Sometimes, he uses his female characters to show the normal life of middle-class families. He describes them in simple daily activities and small moments of pain and joy. At other times, he reveals the deep thoughts and hidden feelings that lie within a woman's heart. Through these stories, readers can gain insight into the silent strength and patience of women. Overall, Dibyendu Palit presents women in a very natural and realistic way. His female characters are not perfect, but they are true to real life. Through them, he helps readers understand the struggles and sacrifices of middle-class women in Bengali society.

### Discussion

দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য জীবনের সময় সীমা বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে একবিংশ শতকের প্রথমার্ধের গোড়ার দিক পর্যন্ত বলা যায়। ১৯৩৯ সালের ৫ই মার্চ বিহারের ভাগলপুরে তাঁর জন্ম। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের আর্থ-

সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহের টানা পোড়েনের মধ্য দিয়েই তাঁর বেড়ে ওঠা। ফলত দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সমাজের সকল স্তরের মানুষের জীবনযাপন, রীতিনীতির মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা যায় তার প্রভাব থেকে তিনিও যে মুক্ত ছিলেন না তা বলাই বাহুল্য। বিশেষত মধ্যবিত্ত সমাজের পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও অস্তিত্ব সংগ্রামের লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আর্থ-সামাজিক দোলাচলতার মধ্যে গড়ে ওঠা সাধারণ নারী-পুরুষের জীবন যুদ্ধ, দাম্পত্যের টানা পোড়েন, অস্তিত্বের সংকট ইত্যাদি সবকিছুই অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘুরে ফিরে উঠে এসেছে দিব্যেন্দুর লেখনীতে। তাঁর লেখায় আধুনিক ব্যক্তি মানুষের যে-সব সমস্যা ও যন্ত্রণার কথা বার বার উঁকি দেয়, তাকে কোনোভাবেই এহ বাহ্য বলে এড়িয়ে উপায় নেই। আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে যে টানা পোড়েন রয়েছে, দিন-রাত্রির যে পৃথক রূপ রয়েছে, তাদের আত্মসর্বস্বতার পাশাপাশি যে অনুশোচনাবোধ রয়েছে এবং শেষপর্যন্ত আত্মিক যন্ত্রণা, দিব্যেন্দু পালিতের কয়েকটি ছোটগল্পের নারী চরিত্রের মধ্যে সেই বেদনার প্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ মানবজীবনের যে নৈরাশ্য সেই ছবিই অঙ্কিত হয়েছে যার তলায় রয়েছে কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব আবার কখনো মমতা ও ভালোবাসা। দিব্যেন্দুর আগ্রহের প্রধান বিষয় মানুষ, এবং মানুষ ও তার প্রাত্যহিক বেঁচে থাকা। তিনি দেখতে বা দেখাতে চেয়েছেন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার শিকার সাধারণ মানুষের অসহায় প্রতিক্রিয়া, তাদের আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনা-অতৃপ্তি-অপ্রাপ্তি-অভিমান এবং একই সাথে তাদের উদ্যোগ ও দুর্বলতাও। বাংলা সাহিত্যের বোধহয় সবচেয়ে বেশি নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের লেখক বলা যেতে পারে তাঁকে। একজন পুরুষ লেখক হওয়ায় নগরের নারীদের জীবনের সংকট ও নির্বেদকে, তাদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে, এবং তাকে পুরুষের কৃত্রিমতা ও প্রতারণার শিকার হতে দেখিয়েছেন। পুরুষমাত্রই যে নারীবিদ্বেষী হয় না, পুরুষ হওয়ায় যে নারীর প্রতি স্নেহ, সহানুভূতি থাকতে পারে, পুরুষ হওয়ায় যে নারীর দৈহিক ও মনোস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বিকতার জটিলতা ও টানা পোড়েনকে সূক্ষ্মভাবে এবং আবেগ-উচ্ছ্বাস বর্জিত ভাবে উন্মোচিত করা যেতে পারে তা তিনি যথার্থভাবেই দেখিয়েছেন। অথচ একইসাথে আগাগোড়া বজায় রেখেছেন এক আশ্চর্য নিস্পৃহতা। মানুষের অসহায়তার কথা, অপ্রাপ্তির কথা বলতে গিয়ে কোনোভাবে তা আবেগকে ছাপিয়ে যায়নি। এই জন্যই বাংলা কথাসাহিত্য তাঁর হাতের স্পর্শে অযৌক্তিক ভাবাবেগের মেদ বর্জিত একটা টানটান রূপ পেয়েছে। তাঁর গল্পের নারীরা প্রায় কেউই মারাত্মকরকম ভিলেনও নয় আবার প্রচণ্ডরকম মহৎও নয়। কিন্তু অনেকেই অনেক অংশেই জটিল, কুটিল, নীচ ও ধান্দাবাজ স্বভাবের। কিন্তু অনেকেই বেশ স্পর্শকাতর ও সূক্ষ্ম মনেরও রয়েছে। আধুনিক নাগরিক সমাজের এটা একটা লক্ষণ। তাঁর কয়েকটি ছোটগল্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে দেখা যায় সভ্য সামাজিক জীবনের সংস্কার, দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে অভ্যস্ত ক্লাস্তিকর সম্পর্কের টানা পোড়েন, সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার শাশ্বত সংঘাতে পারস্পরিক বেঁচে থাকার ছবি। দিব্যেন্দু পালিতের ছোটগল্পের বৃহৎ পরিসরের মধ্যে নারী পরিসর অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে নিয়েছে। নারী তাঁর গল্পে একাধিক ভাষায় উপনীত হয়েছে। দিব্যেন্দুর গল্পে নারী হৃদয়ের অন্তরমহলের বহুমাত্রিকতার মাঝে দুটি অন্যতম দিক লক্ষ্য করা যায়, একটি হল সামাজিক দিক এবং অপরটি হল শারীরিক তথা যৌনতার একটি সূক্ষ্ম আবেদনগত দিক থেকে তার অস্তিত্বের সংকট। নারী হয়ে উঠেছে আশাবাদী, তবে ব্যক্তিগত পিছুটানও সেই আশার পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

তাঁর প্রথম গল্প 'ছন্দপতন' (৩০ জানুয়ারি, ১৯৫৫, আনন্দবাজার) এ নারীর অস্তিত্ব সংকটের চিত্রটিকে দেখতে পাওয়া যায়। গল্পটির বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে দেখা যায় অনসূয়ার দুই মেয়ে সুসমা ও নীলিমা, যাদের দু'জনের জীবন দুটি ভিন্ন রেখায় বিন্যস্ত। কিন্তু কোথাও গিয়ে যেন সেই রেখা মিলে যায় একই বিন্দুতে। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় বিয়ের দু'বছর অতিবাহিত হওয়ার পর প্রথম বাপের বাড়ি আসে সুসমা, তাও স্বামী ছাড়া। বিষয়টা ভালোভাবে নিতে পারেনি অনুসূয়া। লোকজন কী ভাবে কী বলবে এটাই অনসূয়ার চিন্তার অধিক কারণ। অথচ স্বামীর ঘরে মেয়ে এতদিন কেমন ছিল, কেন বিয়ের একেবারে দু'বছর পর তাকে বাপের বাড়ি আসতে হল, এসব নিয়ে তার কোন মাথাব্যথায় যেন নেই। সুসমা জানে সুখের কোন অভাব নেই তার সংসারে কিন্তু তার বৈবাহিক জীবন একেবারেই সুখের নয়। সুখ নেই তার মনের ঘরে। বড়লোক স্বামীর বড়লোকি আদব কায়দার মাঝে পড়ে সুসমা খাঁচার পাখির মতো ছটফট করে বেরিয়েছে। এতদিন পর বাপের বাড়িতে আসতে পেরে সামান্য মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেতে চেয়েছে সে। কিন্তু মায়ের এ হেন মনোভাবে সে শুধু হতাশই হয়নি মনে মনে কষ্টও পেয়েছে। গল্পের অপর গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রটি হলো নীলিমা অনসূয়ার অপর কন্যা।

নীলিমাও বিবাহিত এবং এক্ষেত্রে নীলিমার দাম্পত্য সুখমার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে। স্বামীকে নিয়ে সে বাপের বাড়িতেই থাকে। তবে এই থাকাটা অনেকটাই আলাদা তাদের বিয়ে নিজেদের পছন্দতেই হয়। সুশোভন পেশাগত দিক থেকে একজন লেখক, ভবিষ্যতে তার রোজগারপাতি বাড়বে, এই সম্ভাবনার কথা নীলিমা জানায় তার বিয়ের আগে সুখমাকে। কিন্তু বিয়ের পর ক্রমশ অভাব বাড়তে থাকে এবং শেষপর্যন্ত দারিদ্র্যের কাছে নতিস্বীকার করে নীলিমা স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু যত দিন গেছে অনুসূয়া নীলিমার প্রতি নিজেকে কঠিন করে তুলেছে। মাতৃসুলভ আচরণ তার প্রতি দেখাতে পারেনি সে। নীলিমা নিজের অস্তিত্ব সংকটের টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে অবশেষে নিজের ছোট্ট সংসারকে কোনোক্রমে চালিয়ে নেবার বন্দোবস্ত নিজেই করে। লেখালেখি করে সামান্য যা কিছু সুশোভন উপার্জন করে তার সঙ্গে বাড়তি যোগ হয় নীলিমার সেলাই মেশিন চালিয়ে রোজগারের টাকা। স্বামী সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়িতে থাকার অপমানকে প্রতিমুহূর্তে সহ্য করেও নীরব প্রতিবাদ জানিয়ে নীলিমা এভাবেই দিন অতিবাহিত করেছে।

সুখ ও শান্তি অনসূয়ার কাছে এই দুইয়ের সমান মূল্য। সংসারের যে গতানুগতিক নিয়ম, অনুসূয়া সেই বৃত্তের বাইরে নয়। তাইতো লেখক অনসূয়ার অস্তিত্বকে বোঝাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারংবার এ কথাই বলেছেন—

“হঠাৎ যেমন এসেছিলেন তেমনি হঠাৎই চলে গেলেন অনুসূয়া।”<sup>১</sup>

কিন্তু “যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি হঠাৎই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন অনুসূয়া।”<sup>২</sup> অর্থাৎ কিছু শ্যাওলা থাকে যারা স্রোতের টানে এক ভাবে সেদিকেই ভেসে চলে, স্রোতের বিপরীতে গেলে তো বিপদ, তাই তারা সেই ঝঙ্কি নিতে নারাজ। সমাজ দেখানো পথেই তারা চলে। না হলে তো সমাজে নিজেকে টিকিয়ে রাখাও মুশকিল। এও তো একপ্রকার নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখারই প্রচেষ্টা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল তাদের বাড়ির একটি নিম গাছ। গল্পের শুরুতেই যার পরিচয় পাওয়া যায় সুখমার বাপের বাড়িতে আগমনকে কেন্দ্র করে। সুখমা বাড়িতে আসার সাথে সাথে অনুভব করেছিল সময়ের স্বাক্ষর—

“মাত্র দু বছর এরই মধ্যে কত পরিবর্তন বাড়িতে যেন আর চেনা যায় না।”<sup>৩</sup>

ফাটল ধরেছে যেখানে সেখানে। তবে এই বিবর্ণতার মাঝেই নিজের গৌরবময় উপস্থিতি জোর গলায় ঘোষণা করে চলেছে একমাত্র বাড়ির এই নিম গাছ। অস্তিত্বের সংগ্রামে নেমে একসময় সে বাঁচতে শুরু করে। টিকে থাকার প্রয়োজন নেই এখন তার। এখন সে বাঁচে। এই নিম গাছটি এই গল্পের প্রধান দ্যোতক হয়ে উঠেছে। সুতরাং ‘ছন্দপতন’ গল্পটিতে তিনজন নারীকে তিন ভাবে উপস্থাপন করেছেন দিব্যেন্দু পালিত। যারা প্রত্যেকেই নিজেদের সংগ্রামে নেমে নিজেকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছে। একই সাথে মা ও মেয়ের সম্পর্ক যে সবসময় মমতার উপর, আবেগের উপর নির্ভর করে চলে না, কোন কোন ক্ষেত্রে সেখানেও যে সমাজের প্রথানির্ভরশীলতাই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে, তা এই গল্পের মধ্যদিয়ে দেখিয়েছেন লেখক।

নারীর অস্তিত্বের লড়াই নিয়ে লেখা দিব্যেন্দু পালিতের অপর একটি গল্প ‘মায়াতর’। গল্পের মুখ্য চরিত্র তরু। পিতৃছায়াহীন তরুর একমাত্র আশ্রয় ছিল তার মা। কিন্তু তার ১১ বছরে মায়ের হাতটাও যখন মাথার উপর থেকে সরে যায় তখন এই অনাথ মেয়েটির দূর সম্পর্কের কোনো এক জ্যাঠা বা কাকা তাকে আশ্রয় দেয় তার গৃহে। আশ্রয়ই বটে। যাকে বলে গ্রাসাচ্ছাদন ও মাথার ওপর একটু ছাদ আর বিনিময়ে ‘ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারটা বারোটা পর্যন্ত কাজের জাঁতাকলে বলদের মতো নিজেকে জুতে’ দেওয়া। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে বাঁচার জন্য নয় কোনোক্রমে টিকে থাকার জন্য যুগ যুগ ধরে মেয়েদেরকে সমাজের কাছে কলুর বলদ হয়ে থাকতে হয়েছে। অথচ একই বাড়িতে তারই মতো দু’জন মেয়ের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা তারই চোখের সামনে। অর্থাৎ চিরকালই নারীকে অন্যের দাসত্ব মেনে নিতে বাধ্য করেছে। তাকে নারী হিসেবে তো দূরের কথা একজন রক্তমাংসের মানুষ হিসেবেই গ্রহণ করতে পারেনি এই সমাজ। যে সমাজে পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে দায়ী নারী নিজেই। একটি মেয়েকে যতরকম ভাবে শোষণ করা যায় তার কোন অংশেই ভাটা পড়েনি, এই তরু চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক সেই ছবিকে তুলে ধরেছেন। লাহিড়ী পরিবারে আগত নতুন অতিথি

অলকের দ্বারা তরুর চরম সর্বনাশ সাধিত হয়েছে। তাকে মিথ্যে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে তার চরম ক্ষতি করে এই ছেলোট। তরুর প্রতি অলকের যা ছিল তা কেবলমাত্রই দেহাসক্তি। যার জন্যই পরবর্তীতে লাহিড়ী গিল্লীর জামাই হতে তার বিন্দুমাত্রও সংকোচ হয়নি। অলক জানে তরু তাদের আশ্রিত, তরুকে বিয়ে করলে সে সমস্ত সুখ (স্থূলার্থে) থেকে বঞ্চিত হবে। তরুর থেকে যতটা পাওয়ার তা তো তার পাওয়া হয়ে গেছে সুতরাং আর কেন? বরঞ্চ বড়লোক বাড়ির জামাই হতে পারলে অনেক লাভ। একজন মা কীভাবে তার মেয়েদের ভুল শিক্ষার মধ্য দিয়ে ভুল পথে চালিত করতে পারে, লাহিড়ী গিল্লি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। মেয়েদের প্রাইভেট টিউটর হিসেবে নিযুক্ত করে কীভাবে একজন ছেলেকে স্বীয় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থে উপযুক্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, লাহিড়ী গিল্লি চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক তাকেই দেখিয়েছেন। কন্যাকে দান করে মা বাবার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি লাভ ঘটে তা সে যতই সেই পুরুষ অলক হোক না কেন। কন্যাও যে নারীই, তাকেও তো নিজেকে কোনোরকমভাবে সমাজে টিকিয়েই রাখতে হবে আর টিকে থাকার এই লড়াইয়ে নিজেকে সবারকম ভাবেই প্রস্তুত করতে হবে, প্রয়োজনে আত্মসম্মানটুকুও বিসর্জন দিয়ে। তাই জন্যই তো শুধু তরুরাই নয় বিধিরাও নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে অলকদের দ্বারা বঞ্চিত অবহেলিত লাঞ্চিত ও কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রটুকু হতেও পিছুপা হয় না। তরুর মত সব মেয়েদের একজন বীণাদি থাকে না। থাকলে তারাও হয়তো শেষপর্যন্ত বাঁচার সাহসটুকু পেতো। যদিও বীণাদিও শেষপর্যন্ত তরুর একটা নিশ্চিত আশ্রয়ই কামনা করেছে। যে আশ্রয় তাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে একটা পরিচয় দিতে পারবে।

মা-মেয়ের ভিন্ন স্বাদের ও ভিন্ন রুচির সম্পর্কের অপর একটি গল্প ‘তিন কড়ির মা ও বোন’। গল্পে দেখা যায় তিনু অর্থাৎ তিন কড়ি তার মা তৃপ্তিবালা ও বোন সুধাকে নিয়ে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকে। যেদিন থেকে তৃপ্তিবালা এই বাড়িতে এসেছে সেদিন থেকেই তার ইচ্ছে বোসগিল্লী অর্থাৎ বাড়ি মালকিনের ছেলেকে দিয়ে কোনোভাবে নিজের মেয়েটাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারা। সুধাকে যতরকম ভাবে বিশ্বর দিকে ঠেলে দেওয়া যায় তার কোন চেষ্টায় বাদ রাখে না তৃপ্তিবালা। এদিকে বছরের পর বছর ভাড়া জমতে থাকে। বিশ্বর সাথে সুধার ঘনিষ্ঠতার বিনিময়ে বিশ্ব সুধাকে যে টাকা দিতো তা দিয়ে সংসার চালায় তৃপ্তিবালা। মেয়েকে শরীর বেচে সংসারের খরচ যোগানের পথে নামায় সে। বিশ্বর সাথে সুধার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সে আরো বড় করে দেখতে চেয়েছে। যাতে অর্থাভাবে তাদের সংসার না কাটাতে হয়। একটা সময় পরে যখন চারিদিকে সবকিছু জানাজানি হল তখন বোসগিল্লীর কানে খবরটা পৌঁছাতে চার বছরের জমে থাকা ভাড়ার বিরুদ্ধে তাদের নামে কেস করেন তিনি। কেসে হেরে গিয়ে ১২ বছরের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে তাদের। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় তিনু গেছে লরি ডাকতে। সুধা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মাল পাহারা দিচ্ছে। তৃপ্তিবালা ছাদ থেকে নেমে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতী মেয়েকে নানারকম খারাপ মন্তব্য করতে থাকে। রাস্তার ধারেই ঘর হওয়ায় রাস্তার দোকানের ক্রেতা বিক্রেতার কু-নজর মেয়েকে এড়িয়ে যাবার নয়। এই নিয়েই দু-চার কথা শোনায় তৃপ্তিবালা। সুধা জানে তার মাকে। তার মা যে নিজের মেয়ের সম্মান নিয়ে কতটা সচেতন তা সে জানে। মেয়েকে বলেছে ‘বয়সের ছোকরাকে বাগে আনতে দু’বছর লাগে নাকি? মাথা মাখি তো কম হল না!’ শেষপর্যন্ত যখন দেখা যায় বাড়ি ছাড়তেই হচ্ছে, তখন শেষ চেষ্টাটুকু করতেও ছাড়েনি সে। সুধাকে বিশ্বর ঘরে পাঠিয়ে মনে মনে বলেছে –

“আহা যদি সত্যি সত্যিই মেয়েটা ফেঁসে যেত এতদিনে, তাহলে চাপ দিয়েই কাত করতে পারত বোসগিল্লীকে।”<sup>৪</sup>

সুধার শেষ উপার্জনের উপর ভরসা করেই শুধু ক্ষান্ত থাকেনি, গায়ের জোরে তা ছিনিয়েও নিয়েছে তৃপ্তিবালা। মা যেখানে মেয়ের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায়, তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে চায় মেয়ের মধ্য দিয়ে, তাকে আগলে রাখা তো দূরের কথা একেবারে আঙনের মুখে ঠেলে দিতেও একবারও ভাবেনি তৃপ্তিবালা। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এই কঠিন কাজটি সে কেন করেছে? চরম “অনটনের মধ্যে থেকে গত দু’বছরে নানারকম শারীরিক উপসর্গ দেখা দিয়েছে”<sup>৫</sup> তার। একটু ভালো থাকতে চেয়েছে সে আর পাঁচজনের মতো। ভালোভাবে বাঁচতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। কারণ কবি যতই বলুন ‘মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ’ আমরা ক’জন সেই সত্যিকারের প্রাণশক্তি প্রার্থনা

করি? ষড়রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের উপায় তো জানি, প্রয়োজনে দু-চারজনকে ফ্রিতে সেই জ্ঞানের বুলি আওড়ে দিতে জানি কিন্তু নিজের মধ্যে ধারণ করতে গেলেই যত বিপদ। তাই তো আমরা দেখি “তৃপ্তিবালার অপমান বোধ প্রখর”<sup>৬</sup> হওয়া সত্ত্বেও, পানের দোকানদার রমেশের দৃষ্টিটা ‘খেকো’<sup>৭</sup> জেনেও, বুকের কাপড়টা সামলে নেওয়া সত্ত্বেও, নিজের মেয়ের সম্মানটুকু নিয়ে কোনোদিন মাথা ব্যথা করেনি সে। করলেই তো সমস্যা। অন্তরকে পরিষ্কার রাখতে গেলে তার দায় যে প্রচুর। তার চেয়ে বাইরে থেকে চাকচিক্য দেখালে ভদ্র সমাজে অন্তত মাথাটুকু গোঁজার ঠাইটা হয়। ছেলের উপার্জনে খেয়ে পড়ে কোনোরকম ভাবে দিন কাটিয়ে দিতে পারেনি তৃপ্তিবাল। তাই মেয়েকে উপার্জনের সহজ পথ দেখায় সে। যে পথে তার মাথা গোঁজা গেলেও মাথা তুলতে পারা যাবে না। অথচ সে চাইলেই আরেকটু কষ্ট করে মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে পারতো। পড়াশোনা শিখিয়ে স্ব-সম্মানে মাথা তুলে উপার্জন করার অজস্র পথ দেখাতে পারতো। তাহলে তো তাদের আজ এইদিন দেখতে হত না। এখনো আমাদের সমাজে মেয়েদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিজের সবকিছু বিসর্জন দিতে হয়। কেউ নিজের সাথে সাথে সমাজকেও বোকা বানায় ‘বিয়ে’ নামক শীলমোহরের মাধ্যমে, তো কেউ শুধু নিজেকেই বোকা বানায় সচেতনভাবে। কারণ সে জানে এছাড়া তার গতি নেই। ঠিক যেমন ভাবে মা হয়ে মেয়ের সর্বনাশ রচনা করেছে ‘মায়াতরু’ গল্পের লাহিড়ীগিনী অলকের মতো ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে, ঠিক তেমনি এখানেও তৃপ্তিবালাকে দেখতে পাই দিনের পর দিন কীভাবে নিজের মেয়ের দুর্গন্ধময় পঙ্কিল ভবিষ্যৎ রচনা করেছে নিজের হাতে। বলাই বাহুল্য এসব কিছুই তারা করেছে নিজেদের অস্তিত্ব সংকটের চাপে পড়ে। তাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নারীই নারীকে এইভাবেই টিকে থাকার মন্ত্রই দিয়ে চলেছে। একজন মায়ের এরকম জটিল মনস্তত্ত্ব নিপুণভাবে প্রকাশ পেয়েছে তৃপ্তিবাল। চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। নারীর ভিতরের আরেক নারীকে দেখতে পাই আমরা তার মধ্যে।

দিব্যেন্দুর গল্পে জীবনে যা কিছু ঘটে চলেছে সেই বহমানতার গুরুত্ব অবশ্যই থাকে, কিন্তু তার চাইতেও তাঁর কাছে অনেক বেশি ব্যঞ্জনা মুখ্য হয়ে ওঠে যা কোন ঘটনার সংঘর্ষে উৎপন্ন আবর্তসমূহ এবং সেই আবর্তকেও অতি সূক্ষ্মভাবে প্রকাশের ক্ষমতা রাখেন তিনি। যেমন ‘মাছ’ গল্পটির কথাই ধরা যাক। গল্পটিতে দেখা যায় দারিদ্র্যে ভরা একটি সংসারের ছবি। যেখানে নিরুপমা নিজের জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে সংসারের জাঁতাকলে নিজেকে ক্রমাগত পিষে চলেছে। ষাট টাকার মাইনের স্কুলের চাকরি করে সে। যোগ্যতা ম্যাট্রিক পাস। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হওয়ায় স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের সবরকম ফরমাশ মেনে চলে নীরবে। তার দাদার মৃত্যু ও দেশভাগের পর সপরিবারে কলকাতায় চলে আসা এবং সেখানকার জনবহুল ও বাস্তব জীবনের মাঝে নিজেদের টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বিহারে চলে যাওয়া এবং সেখানে নতুন করে লড়াই শুরু হয় তাদের। এই লড়াই কেবল নিরুপমার নয় তার গোটা পরিবারের। কারণ এই লড়াইয়ে মিশে আছে অর্থাভাব, সুখ- স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু যে লড়াই নিরুপমার সম্পূর্ণ একার, সেখানে জুড়ে আছে তার স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব। ছোট বোন মনুর স্কুলে পড়া বন্ধ হয় দেশ ছাড়ার সাথে সাথেই। পঙ্গু মা বিছানায় শুয়ে শুয়ে মেয়ের বিয়ের স্বপ্ন দেখলেও নিরুপমার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতা সেই স্বপ্নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তার বাবা বেসরকারি অফিসে সামান্য কেরানির কাজ করলেও নিরুপমার রোজগারেই মূলত চলে তাদের নিম্নবিত্ত পরিবার। জীবনের এই দুর্গম পথে চলার ক্ষেত্রে এই কঠিন সংগ্রামের মাঝেও নিরুপমা স্বপ্ন দেখে ফেলে। তাইতো হয়তো কখনো কখনো ইচ্ছে হয় এই মানুষগুলোর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে। হয়তো তাই কখনো রাস্তার কোন এক ‘গালভাঙ্গা, হ্যাংলা, ঘেয়ো - জিব বের করা ইতর ছেলেটার সঙ্গেই’ পালাতে চায় মন। কিন্তু তখনই শরতের মেঘের মতো উঁকি দিয়ে ওঠে বিজনের মুখ, তার শরীর। বিজনকে আঁকড়ে ধরে নিজের বাকি জীবনটা নিশ্চিতভাবে কাটিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখে সে। অর্থাৎ এখানে দেখা যায় নারী শুধু নিজেরই নয়, আত্মজনের অস্তিত্বকেও টিকিয়ে রাখার কঠিন প্রচেষ্টায় ভর্তি হয়েছে। যে স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের স্বপ্নকেই দেখেনা, অন্যের দেখা স্বপ্ন থেকে নিজেকে সরিয়েও ফেলতে পারে, সেটাও তার প্রিয়জনদের জন্যই। তাইতো যতবার বিজনের সাথে চলে যাবার জন্য মন সাড়া দিয়েছে ততবারই পিছন থেকে একটা তীব্র টান অনুভব করেছে সে। বিজনের সাথে ঘুরতে বেরিয়েও শুধুমাত্র বিজনের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিতে পারেনি। বরং উদ্বাস্তদের বস্তির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা একটি বাচ্চা ছেলের এক টুকরো মাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে তার মায়ের সন্তানের ওপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ দেখে নিরুপমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে তার পরিবারের ছবি। এই দৃশ্য দেখে

সে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। আসলে এই মাছ তো কেবল কোন জলচারী জীব নয়। এ যেন নিরুপমা স্বয়ং। সংসারে দুই তরফের আক্রমণে তার নিজের অবস্থাও এই মাছটারই যেন প্রতিরূপ। শেষপর্যন্ত দেখা যায় নিরুপমা তার মাকে জানায় সে বিয়ে করতে পারবে না। অর্থের জন্য লড়াইয়ের যন্ত্রণার কষ্ট একরকম। আর মানুষের নিজস্ব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যন্ত্রণা অন্যরকমই। তার মধ্যে যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে তেমনি থাকে যৌন প্রবৃত্তি যা কখনোই অস্বীকার করার উপায় নেই। সব রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা-বাসনা আশা-আকাঙ্ক্ষা পেতে চেয়েছে নিরুপমা। একটা নিরাপত্তা খুঁজতে চায় সে বিজনের কাছে যা সে হয়তো পেতো কিন্তু যাবো যাবো করেও শেষপর্যন্ত সে যেতে পারেনি। অবদমিত চাওয়া-পাওয়াকে বিসর্জন দিয়ে সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় -

“তোমার দুটি পায়ে পরি মা আমাকে বিয়ে দিওনা আমি বিয়ে করতে পারব না।”<sup>৮</sup>

গল্পটি আমাদের ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’ সিনেমাটির স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও গল্পটি তার আগে লেখা।

‘মাছ’ গল্পটিরই অপর আরেকটি দিক বলা যেতে পারে ‘এক ঋতু’ গল্পটিকে যেখানে নিরুপমার মতোই সুমিত্রাকেও দেখা যায় ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্ব গিয়ে আত্মজনের পাশে দাঁড়াতে। নিজেকে দিনের পর দিন নিঃশেষ করে দিতে। সুনীল চায় সুমিত্রা তাদের বিয়ের কথা ভাবুক। ভালোবাসার কথা বলুক। যেভাবে সে নিজেকে যন্ত্র বানিয়ে তুলেছে তাতে সুনীলের কষ্ট হয়। অফিসের পর আবার সেখান থেকে বেরিয়ে পঞ্চাশ টাকার মাইনের টিউশন করতে চাওয়ার কথা বললে সুনীল বলে-

“সামান্য কটা টাকার জন্য অতো পরিশ্রমের কি দরকার?”<sup>৯</sup>

সুমিত্রা উত্তরে জানায়-

“টাকাটা পেলে সত্যিই কাজে লাগবে। চিত্রার পরীক্ষা সামনে। মার অসুখের পর থেকে সংসারের সব কাজকর্মই ওকে করতে হয়। বিকেলে আবার একটা মেয়েকে পড়ায়। নিজে পড়বে কখন? কাজটা পেলে চিত্রা কিছুটা হালকা হবে।”<sup>১০</sup>

অফিস থেকে বেরিয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় তারা যায় রেস্টুরেন্টে। তিন বছরের সম্পর্কে যেন খুব শীঘ্রই ভাটা পড়ে যায়। সুনীল তা অনুভব করে। কিন্তু সে ভাবে সুমিত্রার মধ্যে এ নিজে যেন কোন ভাবনাই নেই। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে কথাবার্তার “আলোচনা সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে চাকরি আর সংসারে”<sup>১১</sup> আগে বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে “সুমিত্রার চোখে মুখে দপ করে শিশু জ্বলে উঠত।”<sup>১২</sup> কিন্তু এখন তাকে অনেক নিস্তাপ মনে হয়। সুনীলের স্পর্শ, যে সুনীল তার একান্ত কাঙ্ক্ষিত পুরুষ তার স্পর্শ তার সান্নিধ্য এগুলি যেন তার কাছে প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বিয়ের কথা ভাবলে তার কষ্ট হয়, সে কথা স্পষ্টই জানায় সুমিত্রা। কারণ দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েন। এই টানাপোড়েন তাকে ক্রমাগত গ্রাস করে চলেছে। সে চাইলেও পেরে ওঠে না সবকিছু ভুলে শুধু নিজেরটুকু ভাবতে। কিন্তু অবদমিত কামনা বাসনা কখনো কখনো সবকিছুকে ছাড়িয়ে ওঠে। তাইতো তখন সেও বলে ওঠে -

“...মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়। আমি তো নিজের জন্য কিছুই করি না কিন্তু যাদের জন্য করি, তারা কই আমার অবস্থাটা বোঝে না! এত করি, তবুও কারো মন পাই না! মাঝে মাঝে ভাবি আমার কী দায়! ওরা মরুক, আমি বাঁচি। নিজে তো সুখী হই! পারি না। পারলে আমার কবেই বিয়ে হয়ে যেত।”<sup>১৩</sup>

এই সংলাপটির ভিতর দিয়ে একজন রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠে সুমিত্রা। সেও চায় ট্রামের মধ্যে সুনীল আর সে পাশাপাশি বসবে। সুনীলের সান্নিধ্য আসলে সেও চায়। ঠিক যেমনটা চেয়েছিল নিরুপমা বিজন এর কাছে। কিন্তু এই চাওয়ার মূল্য কতটা? যে চাওয়ার মূল্য ক্ষণিকের সেই চাওয়াকে তাই সে ধীরে ধীরে স্রোতের স্বাভাবিক টান বলে মেনে

নিতে শুরু করেছে। তাই যখন ট্যাক্সির নরম গদিতে দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে আরো কিছু পাওয়ার জন্য মন জেগে উঠতে শুরু করেছে, যখন সম্মোহিতের মতো মাথাটা সুনীলের কাঁধে নামিয়ে রেখেছে, যে মুহূর্তে সে একটি ঘর একটু আড়াল কামনা করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ভয় তাকে গ্রাস করেছে আর মুহূর্তের মধ্যে সব চাওয়া সব বাসনা উড়ে পালিয়ে গেছে। তার ক্ষণিকের এই অনুভূতি সুনীলকেও পীড়িত করে। তাই সেও বলে ওঠে –

“যা সারাক্ষণ জিইয়ে রাখতে পারো না, তাকে ধরবার চেষ্টা করো কেন!”<sup>৪৪</sup>

সুনীল ভাবে সুমিত্রার হয়তো সম্পর্কের পরিণতি নিয়ে সেরকম কোন মাথা ব্যাথা নেই। কিন্তু আসলে যে সেও একজন সাধারণ রক্ত মাংসেরই মানুষ তারও যে অনেককিছুই আসে যায়, দশজনের সামনে দাঁড়াতে তারও যে বাধে একথা সুনীল পুরোপুরি বোঝে না। আর সুমিত্রার স্বভাবের এই বৈপরীত্যে ধীরে ধীরে এখন সুনীলেরও যেন মনটা নিস্তেজ হয়ে আসে।

“বিয়ে উৎসব আজকাল সব কেমন অশ্লীল বোধ হয়,”<sup>৪৫</sup>

কিন্তু শেষপর্যন্ত কামনা বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে রাখলেও, কঠিন কংক্রিটের পথ ধরে বহুদূর হাঁটলেও সুনীলের পাশে বসে যেতে যেতে তার উষ্ণতা চোখের পাতা ভিজিয়েছে সুমিত্রা। নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটা আশ্রয় পেতে চেয়েছে সে, যেমনটা চেয়েছিল নিরুপমা। সুমিত্রা ও নিরুপমার মনের একেবারে গভীরে গিয়ে লেখক তাদের ঐক্যেছেন। যারা কেউই প্রচণ্ড মহৎ নয়। তারা সকলেই একেবারে সাধারণ মানুষ। যারা কখনো কখনো তাদের ত্যাগের মাঝেও বিশ্বাসঘাতক হতে চেয়েছে। এই চরিত্র দুটির মধ্য দিয়ে তাদের অতি সূক্ষ্ম ও জটিল মনস্তত্ত্বের ছবিটি উদ্ভাসিত হয়েছে। সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে তারাও যে সাধারণ মানুষ, আত্মিক সংকট ও যৌনতার যে সূক্ষ্ম আবেদন অর্থাৎ অস্তিত্বের সংগ্রামের যে লড়াই, সেই বৃত্তের বাইরে যে তারাও নয়, এই দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে দিব্যন্দু তাকেই দেখিয়েছেন।

নারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপসর্গগুলি তার জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রতিফলিত হতে থাকে, যেখানে নারীর যৌন আবেদনের পরিসরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। যেখানে সে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির মধ্যে নিজের চাওয়া পাওয়াকে বেঁধে রাখতে চায় না। যে পুরুষ তার স্ত্রীর মধ্যে থাকা বিশেষত্বকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল স্বামীত্বের অধিকার বোধ নিয়ে আধিপত্য বিস্তার করে, সংবেদনশীল নারী যে কখনোই তাতে ভোলেনা ‘প্রতিনায়ক’ গল্পের নায়িকা নমিতা তার উদাহরণ। গল্পটিতে লেখক এক নব দম্পতির জীবনকে তুলে ধরেছেন যাদের দাম্পত্য জীবন সবে পাঁচ মাস। ইতিহাসের ছাত্রী নমিতা প্রতিদিন ইউনিভার্সিটিতে বেরোনোর সময় প্রায় এক ঘন্টা সময় নেয় সাজগোজ করতে এমনটাই মনে হয় স্বামী সোমনাথের। নমিতার ক্লাস এগারোটার পর শুরু হয় অথচ ক’দিন ধরে সে দশটাতে বেরোয়। যদিও নমিতা গন্তব্যের দূরত্ব এবং অফিস টাইমের ভিড়ের কারণ দেখায়। সোমনাথের বলা যেকোনো কথা তার কাছে বিশেষ মাত্রা পায় না। গল্পে দেখা যায় বিগত বারো-তেরো দিন ধরে একটানা একটি ছেলে নমিতার সহযাত্রী হয়ে প্রচণ্ড ভিড়ের মাঝে তাকে যেন আগলে রাখে, এমনটাই মনে হতে থাকে নমিতার। ধীরে ধীরে কখন সে তার মনের অভ্যন্তরে এক সূক্ষ্ম জায়গা করে নিয়েছে নমিতা নিজেও তা টের পায়নি। কার জন্যে তার প্রতিদিন তাড়াতাড়ি বেরোনো কার জন্যে তার সাজগোজ এ যেন সে নিজেও বোঝে না। ভিড় বাসে হঠাৎ করে এক অজানা অচেনা স্পর্শ নমিতার হৃদয়ে আলোড়ন তুলেছে। তার পরোক্ষ সাহচর্যে দিনের পর দিন অভ্যস্ত হতে থাকা নমিতার একদিন হঠাৎ মনে হয় কলকাতা শহরের কিছু খারাপ মতলবকারী মানুষের মতো ছেলেটিও হয়তো তাকে অনুসরণ করছে। ভাবনার এই ওঠাপড়া চলতে থাকলে একসময় সে সোমনাথকে বিষয়টা জানায়। স্ত্রীর কথা শুনে সোমনাথ পরের দিন তার সাথে যায়। কিন্তু এই যাওয়াটা নমিতাকে কোথাও যেন একটা আঘাত দিতে থাকে। হয়তো স্বামীকে বলাটা ঠিক হয়নি, তার মনে হয়। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন ছেলেটির দেখা মেলে না, তখন সোমনাথ চলে যেতে চাইলেও নমিতা যেন সেই অপেক্ষা থেকে নিজেকে বের করতে পারে না। যেন সোমনাথের চেয়ে তারই আগ্রহ বেশি তার সহযাত্রীকে দেখার। যার নিঃশ্বাসের উষ্ণতা, আঙ্গুলের সামান্য স্পর্শ দিনের পর দিন নমিতার বুকে অজানা বেদনার সৃষ্টি করে তুলেছে। আজ যার একদিনের অনুপস্থিতিও সে মেনে নিতে পারে না। যেন নমিতা জানে সে নিশ্চয়ই আসবে কারণ সে তাকে অনুসরণ করে। অবশেষে যখন দেখা যায়

দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়েও সে আসে না, তখন বাসের ভিড়ের চাপে ঝুঁকে পড়া স্বামীর নিঃশ্বাসকে নমিতার সাপের বক্রগমন বলে মনে হয়। যেন পর পুরুষের এই সঙ্গ এই ঘনিষ্ঠতা সে চায়নি। তীব্র অস্বস্তিতে ভুগতে থাকা নমিতার নিজেকে এক সময় হঠাৎ ‘বিধবা-বিধবা’<sup>১৬</sup> বলে মনে হয়।

দিব্যেন্দু পালিতের ছোটগল্পের নারীরা কেউই তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বাইরে যাওয়ার চেষ্টায় থাকেনি। তারা কোথাও না কোথাও ধরা দিয়েছে। লেখক নারীর এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার স্তরটিকে দেখিয়েছেন তাঁর গল্পে। তাঁর একেকটি গল্পে নারীরা একেকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই তো তিনি নিজেই বলেছেন একজন লেখক যদি –

“Cannot add new thoughts, new feelings to his inheritance, if he fails to infuse a new meaning into his time and space, he will fail and his writings will not be much meaningful.”<sup>১৭</sup>

বলাই বাহুল্য যে এই ভাবনাকেই তিনি নিজের ক্ষেত্রেও আত্মস্থ করেছিলেন।

### Reference:

১. পালিত, দিব্যেন্দু, ছন্দ-পতন, গল্পসমগ্র ১, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর, ২০১৮, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃ. ১৩
২. তদেব, পৃ. ১৭
৩. তদেব, পৃ. ১৯
৪. পালিত, দিব্যেন্দু, মায়াতরু, গল্পসমগ্র ১, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর, ২০১৮, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃ. ৩৪
৫. তদেব, পৃ. ৩৫
৬. পালিত, দিব্যেন্দু, তিনকড়ির মা ও বোন, গল্পসমগ্র ১, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর, ২০১৮, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃ. ১৬৪
৭. তদেব, পৃ. ১৬৪
৮. তদেব, পৃ. ১৬৬
৯. তদেব, পৃ. ১৬৭
১০. তদেব, পৃ. ১৬৫
১১. পালিত, দিব্যেন্দু, মাছ, গল্পসমগ্র ১, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর, ২০১৮, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃ. ৪৪
১২. সামন্ত, সুবল, বাংলা গল্প ও গল্পকার, ৪র্থ খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, এবং মুশায়েরা, জুলাই, ২০২০, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ. ৫১
১৩. তদেব, পৃ. ৫২
১৪. তদেব, পৃ. ৫৬
১৫. পালিত, দিব্যেন্দু, এক ঋতু, গল্পসমগ্র ১, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর, ২০১৮, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃ. ৮৭
১৬. তদেব, পৃ. ৮৮
১৭. তদেব, পৃ. ৯১
১৮. তদেব, পৃ. ৯২

১৯. পালিত, দিব্যেন্দু, প্রতিনায়ক, গল্পসমগ্র ১, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর, ২০১৮, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃ. ৭৪

**Bibliography:**

দিব্যেন্দু পালিত, গল্পসমগ্র, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর, ২০১৮, কলকাতা - ৭০০০০৯  
সুবল সামন্ত, বাংলা গল্প ও গল্পকার, ৪র্থ খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, এবং মুশায়েরা, জুলাই, ২০২০, কলকাতা - ৭০০০৭৩  
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, পঞ্চাশের দশকের কথাকার, ২ য় সংস্করণ, প্রজ্ঞাবিকাশ, আগস্ট, ২০১৩, কলকাতা- ৭০০০০৯  
সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, মার্চ, ২০২১, কলকাতা- ৭০০০০৯  
বিমল কর, আমি ও আমার তরণ লেখক বন্ধুরা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পত্র ভারতী, আগস্ট, ২০২২, কলকাতা- ৭০০০৩৬  
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক, আশাদীপ, জানুয়ারি, ২০১৪, কলকাতা- ৭০০০০৯